মুকুল যখন ফোটে

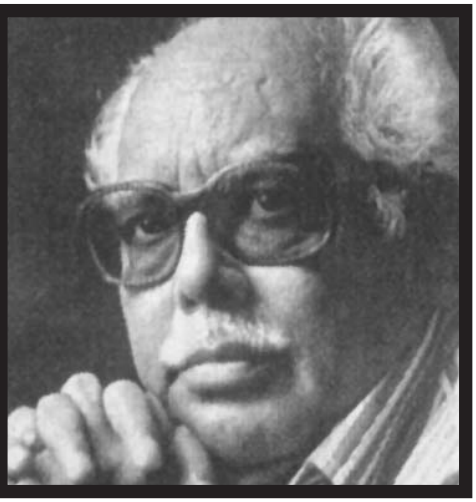

আমীরুল ইসলাম

হাসপাতাল থেকে মুকুল ভাই বেইলি রোডে এসেছিলেন। নিথর, নিষ্কর্ম দেহ। কফিনে শুয়ে আছেন তিনি। শেষ যাত্রার অপেক্ষায়। সাদা চুল, সাদা দাড়ি- চোখ দুটি বন্ধ। আর কোনোদিন কথা বলবেন না তিনি।

মুকুল ভাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়। মুকুল ভাই নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এখন নিজেই ইতিহাস। স্বাধীন বাংলা বেতারের 'চরমপত্র' খ্যাত দুঃসাহসী সাংবাদিক তিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সৈনিক। রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত দেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী।

এসব কি মুকুল ভাইয়ের মূল পরিচয়? সব ছাপিয়ে নিরহঙ্কারী, আড্ডামুখর, জীবন-সংগ্রামী, জীবন- রসিক, অকুতোভয়, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি- একেবারেই অন্য ধরনের এক চরিত্রের প্রতীক মুকুল ভাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের এতো বড় শব্দ-সৈনিক আর কেউ নেই। 'চরমপত্র' তাকে ইতিহাসের প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সার্থকনামা গ্রন্থ লিখেছেন 'আমি বিজয় দেখেছি'। মুকুল ভাইয়ের লেখনীর পরপরই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনার জয়যাত্রা শুরু হয়। বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় জীবন তার। ছাত্র রাজনীতি করেছেন। গণমানুষের উন্নয়নের দীক্ষা নিয়েছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে। জেল খেটেছেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাস নির্মাণ করেছেন।

মুকুল ভাইয়ের কর্মময় জীবনের উপাখ্যান শুনলে বিস্মিত হতে হয়। কেরানী থেকে যুগ্ম সচিব, রেডিও'র মহাপরিচালক, রিপোর্টার থেকে সম্পাদক, বাস-ট্রাকের ব্যবসা থেকে পুস্তক ব্যবসায়ী, প্রবাসে গার্মেন্টস শ্রমিক- কোথাও মুকুল পরাস্ত হননি। সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। বয়স ৭৪ হয়েছিল। পরিণত বয়সেই মুকুল ভাই চিরবিদায় নিয়েছেন। অফুরন্ত প্রাণশক্তি ছিল বলেই বয়স তাকে ছোবল দিতে পারেনি।

মুকুল তাই ছিলেন সচল যৌবনের রূপকার। জীবন থেকে যৌবনের বসন্ত কখনো তিরোহিত হয়নি। এ রকম বিরল চরিত্র বাঙালি সমাজে দেখা যায় না। মুকুল ভাইয়ের দেহান্তর সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

মুকুল ভাই ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে তার কলম ছিল অগ্নিঝরা। আপসহীন। রাজাকারদের উত্থানে তিনি তীব্র দুঃখ পেতেন। তার সাংবাদিক রচনায় সেই রাগ, জ্বালা ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে।

কে আর মুকুল ভাইয়ের মতো দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে? রাজনৈতিক অসততার কথা চোখে আঙুল দিয়ে কে দেখিয়ে দেবে?

তার সমগ্র জীবনটাই ছিল মহাকাব্যিক উপন্যাসের মতো। এতো বিস্তারিত জীবন-কথা গড়পড়তা বাঙালিদের হয় না। এ জন্যেই মুকুল ভাই এক ও অদ্বিতীয়। চিন্তায়-চেতনে, আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, কৌতুকে-পরিহাসে, আড্ডায়-গল্পগুজবে মুকুল ভাই অদ্বিতীয়।

জীবনকে খুব সহজভাবে নিয়েছিলেন বলেই তিনি ছিলেন স্বার্থত্যাগী, নির্মোহ, আত্মপ্রচারবিমুখ।

দুর্ভাগ্য আমাদের, মুকুল ভাইয়ের মতো প্রিয়জনেরা একে একে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

মুকুল তাই ছিলেন সচল যৌবনের রূপকার। জীবন থেকে যৌবনের বসন্ত কখনো তিরোহিত হয়নি। এ রকম বিরল চরিত্র বাঙালি সমাজে দেখা যায় না। মুকুল ভাইয়ের দেহান্তর সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ...

দুই.

মুকুল ভাইয়ের রাশভারী পরিচয় সকলেই জানেন। ঘরোয়া মুকুল ভাই, মজলিশি মুকুল ভাই, সাগর পাবলিশার্সের চেয়ারে বসা মুকুল ভাই ছিলেন একেবারেই অন্যরকম মানুষ। জীবন-অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি এক ব্যক্তি তিনি। অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষিত ও নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি তিনি। বাবা সাদত আলী আখন্দ ব্রিটিশ-পুলিশের কর্মকর্তা। নিজেও লেখক ছিলেন। তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান ছিলেন মুকুল ভাই। একেবারেই বেপরোয়া, অকুতোভয়, দ্বিধাহীন চিত্ত। ভরাট ও জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। চেতনায় ছিলেন বোহেমিয়ান, উদাসীন। যেকোনো মোহকে অনায়াসে তাচ্ছিল্য করতে পারতেন।

সাংবাদিকতা ও সরকারি চাকরি ছাড়াও বহু বিচিত্র পেশা গ্রহণ করেছেন দেশে-বিদেশে। লন্ডনে গরুর চামড়া কেটে জ্যাকেট বানানোর মতো কায়িক পরিশ্রম কিংবা চালের ব্যবসা- কোনো কিছুতেই তিনি পরাস্ত হতেন না।

কাজকে ভয় পেতেন না। অবহেলা করতেন না। তারই উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে বেইলি রোডের 'তবুও বই পড়ুন' স্লোগান সমৃদ্ধ সাগর পাবলিশার্স। প্রতিদিন তিনি ক্যাশ-কাউন্টারে বসতেন। ক্রেতাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। সহজ সাধারণভাবে মিশে যেতে পারতেন মানুষের সঙ্গে। 'মা' সম্বোধনে কথা বলতেন মহিলাদের সঙ্গে। গুণীদের দেদার সম্মান করতেন। চা আর সিগারেট ছিল নিত্যসঙ্গী। দিনে দুই প্যাকেট ৫৫৫ ব্র্যান্ডের সিগারেট উড়িয়ে দিতেন অনায়াসে।

মুকুল ভাইয়ের জীবনে যৌবন কখনো অস্তমিত হয়নি। চিরযৌবনা বলতে যা বোঝায়, মুকুল ভাই ছিলেন তারই নিদর্শন। তরুণদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হতে সময় লাগতো না।

বইয়ের দোকানদারি করার মধ্যে তার কোনো গ্লানি ছিলো না। তিনি আনন্দ পেতেন। বেইলি রোডে যখন মানুষজনের ভিড় ছিল না, তখন এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তার

ক্যারিশমাতেই জমে ওঠে সাগর পাবলিশার্স। নিজে প্রকাশকও ছিলেন। মনে পড়ে শওকত ওসমানের কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। শওকত ওসমানের সঙ্গে তার সখ্য প্রায় কিংবদন্তি পর্যায়ের।

বেইলি রোড দেখতে দেখতে জমজমাট হয়ে উঠলো। অধিকাংশ খাবারের দোকান- ফাস্টফুড, তেলে ভাজা, ফুচকা, চটপটি। কখনো কখনো মুকুল ভাই হাসতে হাসতে বলতেন,

- আরে মিয়া, বইয়ের ব্যবসা বাদ দিয়া ফুচকা, চটপটির ব্যবসা করলে বহুৎ ভালা হইতো!

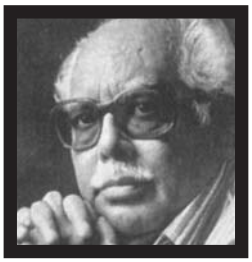

অসম্ভব পরিহাসপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি মুকুল ভাই। তার গল্প শুনে হাসিতে গড়িয়ে পড়েননি এমন সমঝদার পাওয়া দুর্লভ। আমরাই হাসতে হাসতে কতোবার দোকানের সামনের রাস্তায় গড়াগড়ি খেয়েছি।

এ সবই এখন স্মৃতি। এখন ইতিহাস।

মুকুল ভাইয়ের কোনো সংস্কার ছিল না। মেধার ভেদজ্ঞান করতেন, বয়সের ভেদজ্ঞান ছিল না তার। খুব সহজভাবে সিগারেট অফার করতেন। অ্যাশট্রে বাড়িয়ে দিতেন।

- খাও মিয়া, আঠারো বছরের পরে বাপ-পোলা বন্ধু। সিগ্রেট ধরাও।

আমরাও অসংকোচে তার সঙ্গে কত জানা-অজানা বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি।

মুকুল ভাই নখ থেকে চুল পর্যন্ত ছিলেন পরিহাসপ্রিয়। হাস্য কৌতুক, রঙ্গ-ব্যঙ্গে অনন্য সাধারণ ছিলেন। জীবনের নানামুখী অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতেন অকপটে। কোলকাতার ওয়েলিংটন মোড়, ঢাকার তাঁতীবাজার, বকশীবাজার, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, পঞ্চাশ দশকে জেলজীবন, দিনাজপুরের সাঁওতালদের কাহিনী, বগুড়ার শৈশব- কতো গল্প। এর কিছু কিছু অংশ জীবনের শেষ দিকে তিনি 'শতাব্দীর কান্নাহাসি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটির পরবর্তী খন্ডগুলো লেখার তীব্র বাসনা ছিল।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও মুকুল ভাই তার জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলেননি। পত্রিকা পড়তেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রয়োজনীয় অংশ ছিঁড়ে রাখতেন। কলাম লেখার সময় তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতেন এভাবেই।

মুকুল ভাই জাত-সাংবাদিক ছিলেন। লিখতে পারতেন অনর্গল। গোটা গোটা অক্ষরে লিখতেন। সবচেয়ে আনন্দ পেতেন গল্প করে আর লেখালেখি করে। লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল রাজনীতি। দেশ-বিদেশের রাজনীত নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা ছিল। যেকোনো রাজনৈতিক বিষয়কে তিনি অন্য আলোয় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। রাজনৈতিক-সমীক্ষক মুকুল ভাই ছিলেন অতুলনীয়।

সাংবাদিকতা সূত্রে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সব বড় বড় নেতাদের সঙ্গে ছিল তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। শেরে বাংলা, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, মণি সিংহ, মওলানা আকরাম খাঁ, বঙ্গবন্ধু প্রত্যেকের। 'কাছ থেকে দেখা' অসংখ্য স্মৃতি-কাহিনী ছিল মুকুল ভাইয়ের অমর মণিরত্ন। এঁদের অনেক গল্প মুকুল ভাইয়ের ভরাট কণ্ঠে বহুবার শুনেছি। একেবারে জীবন্ত গল্প। ইতিহাসের স্মৃতিখন্ড থেকে তুলে আনা সেসব রক্তমাংসের গল্প কে শোনাবে আমাদের!

সাগর পাবলিশার্সে যারা নিয়মিত আসতেন তাদের মধ্যে শওকত ওসমান আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মুকুল ভাইও চলে গেলেন। মুকুল ভাই যে চেয়ারটাতে বসতেন কবি ভাই (মুকুল ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) সেটা কি সংগ্রহ করবেন? দোকানেও কি মুকুল ভাইয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে কিছু করা যায় না? দোকানের জালাল বা অলিও অনেক স্মৃতির অংশীদার। তারা মুকুল ভাইকে 'নানা' ডাকতো।

বইয়ের দোকানদারি করার মধ্যে তার কোনো গ্লানি ছিলো না। তিনি আনন্দ পেতেন। বেইলি রোডে যখন মানুষজনের ভিড় ছিল না, তখন এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তার ক্যারিশমাতেই জমে ওঠে সাগর পাবলিশার্স। নিজে প্রকাশকও ছিলেন

মুকুল ভাইয়ের কোনো চাওয়া ছিল না। তাই তিনি ছিলেন সৎ ও নির্ভীক। রাজনৈতিক দলের পক্ষে কথা বলতেন কিন্তু স্বার্থের জন্য লেজুড়বৃত্তি করেননি কখনো। সত্য উচ্চারণ করতেন নির্ভয়ে।

আরেকটি বড় গুণ ছিল মুকুল ভাইয়ের। যে কোনো সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন তিনি শিশুর মতো। তার সম্পর্কে মিথ্যাচার করলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। প্রকৃত সমালোচনা সহজভাবে গ্রহণ করতেন।

অসম্ভব জীবন-রসিক ছিলেন বলে সবকিছুই তার কাছে ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। নিজেকে নিয়ে তেমন ভাবতেন না। দেশ ও দেশের মানুষ নিয়ে তার ভাবনার শেষ ছিল না।

আনন্দময় জীবন তার পছন্দ ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ঢাকা ও লন্ডন তার প্রিয় শহর। চা-কফি আর সিগারেট- এই ছিল তার খাদ্য তালিকা। কোনো কিছুতেই পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। শখের মধ্যে ছিল আত্মকাহিনী ধরনের বই পড়া। রাজনৈতিক ইতিহাসের বইও পছন্দ করতেন। ঢাকা ক্লাবে যেতেন নিয়মিত। হাউজি খেলতে ভালোবাসতেন। এক সময় প্রেসক্লাবে আড্ডা মেরে 'মিথে' রূপান্তরিত হয়েছেন।

আমাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতো স্বার্থ আদায়ের ইঁদুর দৌড়ে মুকুল ভাই কখনো শামিল হতেন না।

অপরিমেয় প্রাণবান ছিলেন বলে তার বন্ধুভাগ্যও বিপুল ও বিস্তারিত। বিখ্যাত-অখ্যাত সবাই তার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ ও সুহৃদ।

সব বয়সীদের ভালোবাসার জন্য মুকুল ভাই সার্থক বাঙালি চরিত্রের উজ্জ্বল প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। মুকুল ভাই যতো ভেবেছেন ততো বলেননি, যত বলেছেন, ততো লেখেননি। বঞ্চিত করেছেন আমাদের।

তিনি সিংহহৃদয় পুরুষ। মুকুল ভাই যৌবনের রোল মডেল। তাকে বিস্মৃত হবার কোনো উপায় নেই।

যদিও আমরা বড় বিস্মৃতপ্রবণ জাতি।

তিন.

মুকুল ভাইয়ের বাচনভঙ্গি ছিল অনন্য সাধারণ। ঢাকাইয়া শব্দের সঙ্গে সাধু-চলিত শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে অপূর্ব বাকরীতি তৈরি করেছিলেন। তার কথা শুনতে হতো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। গল্পচ্ছলে তিনি জীবনের নির্যাস তুলে আনতেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার গল্প বলতেন। অসম্ভব স্মৃতিধর ব্যক্তি। রাজনৈতিক ইতিহাসের চলমান সাক্ষী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন। দেশ-বিদেশে সাংবাদিকতা সূত্রে সফরসঙ্গী হয়েছিলেন অনেকবার। সেসব স্মৃতি কাহিনী বলতে গিয়ে আলোয় উদ্ভাসিত হতেন মুকুল ভাই।

মুকুল ভাইয়ের কণ্ঠস্বর ছিল জলদগম্ভীর, মেঘমন্দ্র। গমগম করতো তার প্রতিটি শব্দ। এই শব্দের জাদুতেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। ১৯৭১-এ সমগ্র বাঙালি জাতিকে। 'চরমপত্র' ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

যারা মুকুল ভাইকে চিনতেন তাদের কানে নিশ্চয়ই মুকুল ভাইয়ের বাক্যবাণের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। 'শোনো মিয়া' উদা, ভরাট কণ্ঠে মুকুল ভাইয়ের এই আহ্বান উপেক্ষা করেছে এমন কেউ আছে কি? বহুদিন আমরা সাগর পাবলিশার্সে বসে বসে মুকুল ভাইয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব সব গল্প শুনেছি। এখনো চোখ বন্ধ করলে স্পষ্টভাবে সেই ধ্বনির তরঙ্গ শুনতে পাই। অসংখ্য গল্প থেকে কয়েকটি মণিকাঞ্চন পাঠকদের না শোনাতে পারলে আক্ষেপ থেকে যাবে।

মুকুল ভাই প্রাণখোলা হাসি দিয়ে একদিন বললেন,

- শোনো মিয়া, আমার বাপে কইছে- তিন

জায়গায় কোনো দিন মিথ্যা কথা কইবি না। উকিলের কাছে, ব্যাংকের কাছে আর ডাক্তারের কাছে। উকিলের কাছে মিথ্যা কইলে মামলা উল্টাপুল্টা হয়া যাইবো। ব্যাংকারের কাছে মিথ্যা কইলে টাকার হিসাব মিলবো না। আর ডাক্তারের কাছে মিথ্যা কইলে ভুল ট্রিটমেন্ট হইবো। বুঝছো মিয়া-

শ্লীল-অশ্লীল শব্দ ব্যবহারেও মুকুল ভাই ছিলেন অকপট। খুব স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি তথাকথিত অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করতেন তার বাক-কথনে। কখনো মনে হতো না তিনি গালাগালি করছেন। সহজ ও সুন্দর মনে হতো সেইসব বাক্য। তার গল্প না শুনে ওঠার কোনো উপায় ছিল না কারো।

জ্যেষ্ঠ পুত্র 'কবি' ছিলেন মুকুল ভাইয়ের অকৃত্রিম বন্ধু। পুত্রের সামনেই অনেক খোলামেলা কথা বলতেন।

আড্ডায় বয়সের সীমানা তার কাছে কখনোই বড় নয়। মনে পড়ে- একদিন বললেন,

- ঐ মিয়া, বাঙালি মুসলমানগো লগে কুনুদিন মদ খাইবা না।

মাইয়াগো পিছে ঘুরাঘুরি করব না।

যদি করো, মনে রাখবা ঘটনার চেয়ে গল্প রটবো বেশি।

বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হয়েও জীবন-যাপন করতেন অসংস্কারাচ্ছন্ন। খাঁটি বাঙালি তিনি- মনে-প্রাণে এই বিশ্বাস করতেন। ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। সকল ধর্মমত ও ধর্মপথের উর্ধ্বে ছিল তার অবস্থান।

শেষ দিকে মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন,

-ঐ মিয়া, চ্যানেল আইতে কি আলতু-ফালতু টক-শো করো। সাগররে কও- আমি ওয়ান ম্যান শো কইরা দিমু। লোকে তাজ্জব হয়া আমার কথা হুনবো। লন্ডনে থাকনের সময় বহুত টাইপের টক-শো দেখছি।

খালি একটু চমক লাগায়া কথা কমু। পাবলিক খাইবো মানে, পাগল হয়া যাইবো কথা হুইন্যা।

যথারীতি এই প্রস্তাব সাগর ভাইকে কখনো বলা হয়নি।

মুকুল ভাইয়ের মগজের ভাঁজে ভাঁজে অনেক অভিনব প্ল্যান-আইডিয়া গিজগিজ করতো। পুরনো আইডিয়া ভুলে যেতেন। নতুন আইডিয়া নিয়ে কথা বলতেন। অসম্ভব সৃজনশীল ছিলেন তিনি। একদিন বলেছিলেন,

- একটা নাটক লিখুম। তোমরা বানাইবা নাকি কও।

আমরা সোৎসাহে রাজি।

- সাগররে কও, নাটকটা দারুণ হিট করবো।

সাগর মানে আমাদের ফরিদুর রেজা সাগর। চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

-নাটকের কাহিনীটা শোনান মুকুল ভাই-

মুকুল ভাই সোৎসাহে উপন্যাস শুনিয়েছিলেন আমাদের। 'মঙ্গা' নামের এক সাঁওতাল। হতদরিদ্র, ভূমিহীন গ্রামবাসী। সাঁওতাল পল্লী থেকে খুনের দায়ে সে এসেছিল দিনাজপুর জেলে। মঙ্গা কোনোদিন গাড়ি দেখেনি। দালান দেখেনি। আর তার ভাতের নিশ্চয়তা ছিলো না কখনো। সেই 'মঙ্গা' জেলে এসে আশ্রয় পায়। মুক্তি পেলেও সে জেল থেকে আর ফিরতে চায়নি নিজ গ্রামে।

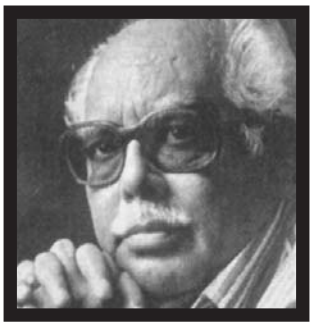

আমরা দীনহীন জাতি। জানি, এই জাতির কাছ থেকে মুকুল ভাই কিছু প্রত্যাশাও করেননি। থাকতেন অবিচলিত উদাসীন, ভ্রূক্ষেপহীন। আজ মুকুল ভাই নেই। তার মৃত্যুর পর আমরা টের পাচ্ছি- কতো বড় ছিলেন তিনি...

অদ্ভুত নাটকীয়ভাবে গল্পটা বলেছিলেন মুকুল ভাই। সাঁওতালদের উত্তরবঙ্গীয় মুখের ভাষাও নিপুণভাবে বর্ণনা করেছিলেন। মুকুল ভাইয়ের জেল জীবনের ঘটনা এটি। সময়কাল '৪৮-৪৯ সাল।

মুকুল ভাইকে প্রেরণা দিয়েছিলাম নাটকটি লেখার। মুকুল ভাই হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

-আমিও অভিনয় করুম এই নাটকে।

না, অনেক ফেলে রাখা কাজের মতো এই নাটকটিও মুকুল ভাই আর লেখেননি।

৪.

মুকুল ভাই কতোটা জীবন-রসিক ছিলেন তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

দশ-বারো বছর আগে মুকুল ভাইয়ের গলব্লাডারে অপারেশন হয়। চিকিৎসা করার লক্ষ্যে তিনি কলকাতা যান। তার বন্ধু-চিকিৎসক অপারেশন থিয়েটারে রঙ্গ-রসিকতা করতে থাকেন। মুকুল ভাইও অর্ধাঙ্গ অচেতন অবস্থায় রসিকতায় অংশ নিচ্ছেন।

গলব্লাডারে বড়সড় একটা পাথর পাওয়া যায়। ডাক্তার বললেন,

- চরমপত্রের মুকুলদা, অনেক বড় পাথর পাওয়া গেছে। নিন দেখুন। ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখা যাবে।

মুকুল ভাই ঘাড় ফিরিয়ে পাথরটি দেখে বললেন,

- না দাদা, আংটি বানিয়ে পাথরটা হাতে রাখব। পেটে ছিল, এখন হাতের আঙুলে থাকবে।

এই হচ্ছেন মুকুল ভাই। অপারেশন থিয়েটারেও তিনি নিঃসংকোচে রসিকতা করেছেন।

লন্ডন থেকে চিকিৎসা শেষে ফিরে এসেও একই রকম উচ্ছ্বাসময় ছিলেন তিনি। বেইলি রোডের ফ্ল্যাটে বসে আত্মকাহিনী রচনা শুরু করেন। বইটির প্রথম খন্ড 'অনন্যা'।

প্রকাশনীর মনিরুল হক এইবার বইমেলায় প্রকাশ করেন। মনিরকে মুকুল ভাই জানিয়ে দিলেন,

-বাঁইচা থাকলে বাকি খন্ডগুলো লেইখা যামু। জীবনের সব কথা খোলামেলা লিখুম। বাঙালিরা সত্য কথা কয় না। খালি ডরায়। আমার ডর নাই। কার লগে কি হইছে সব লিখা দিমু।

বাকি খন্ড আর কোনোদিন মুকুল ভাই লিখবেন না। আর কথা বলবেন না। সেই প্রাণখোলা উচ্চকণ্ঠ আর ধ্বনিত হবে না। আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অকুতোভয় বীরকে আমরা কিছুই দিতে পারিনি।

আমরা দীনহীন জাতি। জানি, এই জাতির কাছ থেকে মুকুল ভাই কিছু প্রত্যাশাও করেননি। থাকতেন অবিচলিত উদাসীন, ভ্রূক্ষেপহীন।

আজ মুকুল ভাই নেই। তার মৃত্যুর পর আমরা টের পাচ্ছি- কতো বড় ছিলেন তিনি। কতো মানুষের ভালোবাসায় ধন্য হয়েছিলেন তিনি।

আমরা সাগর পাবলিশার্সে যাব। মুকুল ভাইয়ের দেখা পাব না- এই কথা ভাবতেই অশ্রুসজল হয়ে উঠছি। আর কেউ আমাদের বলবে না,

-ঐ মিয়া বহো খবর কি?